সংবাদ

তারিখ 22 APR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

রাজনীতির পথে প্রান্তে

রাজনীতি ও শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্রকার আপসই কাম্য নয়

ফকির আবদুর রাজ্জাক

'৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন- ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। '৭৫-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় এই অশুভ শক্তির মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। ৩/৪ বছর চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে ক্রমান্বয়ে তারা সংগঠিত হতে থাকে। জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর এবং সৌদি আরব ও পাকিস্তানে পালিয়ে থাকার পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কৃপায় জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে দলের আমির হয়ে পূর্ণ উদ্যমে সংগঠনের কাজকর্ম শুরু করেন। দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আবার প্রাণ ফিরে পায়। বেশি দিন লাগেনি তাদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে। ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সভা, আলোচনা ও অসংখ্য কলাম লিখে নিজের মতামত স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছি- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তির সামনে সবচেয়ে বড় এবং কার্যকর শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে- জামায়াত ও বিভিন্ন নাম পরিচয়ের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি। জিয়া-এরশাদ-খালেদার চাইতেও এরা অনেক বেশি মারাত্মক ও শক্তিশালী অপশক্তি প্রাথমিক পর্যায়েই যদি এই অশুভ শক্তিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে দেশ, জাতি ও অসাম্প্রদায়িক জনগণকে বিশাল মূল্য দিতে হবে। এমন একজন ক্ষুদ্র ও অনুলেক্ষ্য লেখক, সমাজচিন্তক ও রাজনীতিকের কথা সেদিন কেউ গুরুত্ব দেয়নি। এখনও দেবে না। তবে এখন সেই মূল্য দেয়া শুরু হয়েছে। এবং বিশাল আকারেই তা দিতে হচ্ছে। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার গহ্বর থেকেই এখন জন্ম নিয়েছে জঙ্গিবাদ। যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারগুলো তাই আত্মরক্ষার জন্যেই এখন বলতে শুরু করেছে- জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক ব্যাপার। বাংলাদেশও এমনই বলছে। অথচ যখন দেশে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয়েছে, ক্রমান্বয়ে সেই বীজ থেকে চারাগাছ হয়েছে এবং গাছগুলো যখন বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তখনও ক্ষমতাসীন সরকার ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলো আত্মকলহেই বেশি সময় কাটিয়েছে। আসল শত্রুকে প্রতিরোধ করার কোন কার্যকর উদ্যোগই নেয়নি। স্বাভাবিকবাবেই এখন তা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

শুধু তাই নয়, অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দেশে দেশে ঐসব সন্ত্রাসী-জঙ্গি ইসলামী শক্তির সঙ্গে হয় আপস করে, নয়তো দাবি মেনে নিয়ে, বা একটা সমন্বয় সাধন করে নিজেরা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে- কৌশলগত সম্পর্ক। বাস্তবতা হলো– মৌলবাদী ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির কৌশলের কাছে নতি স্বীকার করেই বহু দেশের সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকার। ভারতের বিজেপি জোটের মধ্যে এমন একাধিক দল রয়েছে যারা হিন্দু ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক। যাদের সাথে বিজেপির মূল নেতাদের অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিমত রয়েছে। তবু প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও বাম মোর্চার বিরুদ্ধে তারা ঐক্য গড়ে এখন ভারতের ক্ষমতায় আসীন রয়েছে। পাকিস্তানে বা আফগানিস্তানে তালেবান নামক ধর্মান্ধ জঙ্গি শক্তির সঙ্গে আপস করে তাদের সরকার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ধরেই নেয়া যায় ঐ সব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় বা তাদের সাথে সহঅবস্থান করায় মূল রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং পক্ষান্তরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে ঐ সব মৌলবাদী ধর্মান্ধ শক্তি। অচিরেই তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দেশে দেশে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সরকার কায়েম করবে। আজকের আধুনিক বিশ্বের উন্নয়ন গতিধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তারা। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, তুরস্ক, মিসর সেই পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ঐ সব দেশে প্রগতিশীলতার যেসব ধারা এক সময় প্রবাহিত হয়েছিল তা আজ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। মৌলবাদী, সন্ত্রাসী জঙ্গি গোষ্ঠীরা সবকিছু কব্জা করতে আজ উদ্যত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে চরমভাবে আঘাত হেনেছিলাম সত্য। কিন্তু দেশ ও সমাজ থেকে তাদের মূলোৎপাটন করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এবং '৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন না ঘটলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমতা দখল ও বারবার সামরিক শাসকদের উত্থান দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি বেড়ে উঠতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। রাজনীতি ছাড়া অর্থনীতি, সামাজিক, শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তি ব্যাপক সহায়তা পেয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী সরকারসমূহের কাছ থেকে। তাদের প্রশ্রয় ও সহায়তাতেই দেশব্যাপী হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। যার সাথে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম, নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের কোনই মিল নেই বরং পরিপন্থী। ধর্মান্ধ শক্তি সুদূর পরিকল্পনা নিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার বাড়িয়ে তোলে। যা এখন মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। কোন সরকার যদি সর্বশক্তি নিয়েও চেষ্টা চালায় তাহলেও মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। বিকৃত ধর্মের উন্মাদনা এখন এতটাই ব্যাপক এবং সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করেছে যে, সরকার বা সম্মিলিত রাজনৈতিক শক্তি চেষ্টা করলেও ঐ উন্মাদনা প্রতিরোধ করতে পারবে না। এই পরিস্থিতি যে এক সময় হবে তা অনেক আগেই আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষেরাও আশঙ্কা করেছিল। কেবল আশঙ্কা বা সুদূর কোন চিন্তাই করতে পারেনি দেশের রাজনৈতিক শক্তি, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে একদা জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছিল।

পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর কেন স্বাধীনতা লাভের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুর নিজের সংগঠনসমূহ এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুদ্ধে অংশ নেয়া রাজনৈতিক দলগুলো খুনি-ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল? সে ব্যাপারে ঘটনার এক বছরের মধ্যেই আমাদের যে মূল্যায়ন ছিল পরবর্তীকালে সেটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে 'হতবিহ্বল' হয়ে পড়েছিল বলে নিজেদের ব্যর্থতা চাপা দিতে চাইলেও বাস্তবতা হলো- মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পরে বা ১৬ ডিসেম্বরের পর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া দলসমূহের এক বিশাল অংশ নেতাকর্মী তাদের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছিল। '৭১-এ তারা যে দেশপ্রেম, ত্যাগের মনোভাব এবং সাহসের ঐতিহাসিক উদাহরণ রেখেছিল মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তারা ঐ গুণাবলি হারিয়ে ফেলেছিল। তখন অধিকাংশই পরিত্যক্ত ও ধ্বংসস্তূপের স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের তীব্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। ফলে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার পর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সম্পদসহ আত্মরক্ষার জন্যে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার কোন মানসিকতা ও সাহসই ছিল না। সেদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ছিল আমাদের ঐ মূল্যায়ন। সার্বিকভাবে এহেন ব্যর্থতার মধ্যদিয়েই দেশের সকল প্রতিপক্ষ বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার পুনর্গঠিত হবার ব্যাপক সুযোগ পেয়ে যায়। যার খেসারত দিতে হচ্ছে আজ জাতিকে। অবশ্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া রাজনৈতিক দলসমূহ এতবেশি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল যে (যার রেশ এখনও কাটেনি) একাত্তরের ঐক্যসম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। যার সুযোগ গ্রহণ করেছিল প্রতিপক্ষ, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক গোষ্ঠী।

মরহুম জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আরোহন করেছিলেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ সকল প্রকার ডান-বাম শক্তির ওপর ভর করে। তার ক্ষমতার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী। সেই থেকে ৮০ ও ৯০ দশকে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কাছে টেনে প্রতিপক্ষকে নির্বাচনে ঘায়েল করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় বিএনপি, জাতীয় পার্টি এমনকি আওয়ামী লীগের মধ্যেও। আওয়ামী লীগের মধ্যে যখনই এ ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করেছি তখনই তার প্রতিবাদ করেছি এবং বলার চেষ্টা করেছি- ধর্মান্ধ কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যতই কাছাকাছি আসার মনোভাব দেখাক না কেন নির্বাচনে তারা বিএনপি-জাতীয় পার্টি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে না। এটা শুধু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কৌশল নয়, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরও কৌশল। অতএব নিজের ও সমমনাদের শক্তির ওপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এক ধরনের সমঝোতা হলেও মফস্বল এলাকায় তাদের নিজেদের প্রার্থী না থাকলে প্রথম পছন্দ হবে বিএনপি-জাতীয় পার্টি। তাই হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে যে সখ্যই করা হোক না কেন নীতি, আদর্শ, কর্মসূচির ভিন্নতা, ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে বিশাল মতপার্থক্য, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজপ্রগতির চিন্তায় বিপরীত ধর্মী চেতনার কারণে কোন ইস্যুতেই হেফাজতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন কৌশলগত সম্পর্কই টিকবে না। বরং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে হেফাজতের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক নিয়ে নানা আলোচনা, সমালোচনা- কথা উঠেছে। দেশের রাজনীতি সচেতন মাত্রেই এই সম্পর্কের বিষয়টি ভালো চোখে দেখছে না। এমনকি আমার ধারণা ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের কর্মী ও সমর্থকদের এক বিরাট অংশই এ সম্পর্ককে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছে না। আদর্শিকভাবেও হেফাজতে ইসলাম মূলত দেওবন্ধী সুন্নী যাদের সঙ্গে ব্রিটিশ আমল থেকেই মহাবিরোধ রয়েছে আলিয়া মাদ্রাসাপন্থী সুন্নী মুসলমানদের। এই দুই গোত্রকে এক সাথে নিয়ে কোন সরকার চলতে পারে না। সরকার হেফাজতীদের মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণীকে মাস্টার ডিগ্রির মর্যাদা দিয়েছে অথচ পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রি পর্যায়ের সাথে ঐসব কওমি মাদ্রাসার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়নি। দেশবাসী জানে বাংলাদেশে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো কওমি মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে। তারা নিজেরাই বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে পাঠদান ও সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। সরকারের ধার ধারে না। এখনও তারা মাস্টার ডিগ্রির সমমর্যাদা সরকারের কাছ থেকে আদায় করলেও নিচের দিকের অন্যান্য ডিগ্রির জন্যে সরকারি অনুমোদন তারা চায় না। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন নৈরাজ্য কোনভাবে মেনে নেয়া যায় না। যে কোন মূল্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই নীতি-নিয়মে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে হবে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকেও নিয়মশৃঙ্খলা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে তার আধুনিক উন্নয়নে সরকারকে কাজ করতে হবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শের প্রশ্নে কোন প্রকার আপস যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার আপস বা দ্বৈতনীতি মেনে নেয়া যায় না। সে কারণেই দেশের সচেতন মানুষের মনে আজ সৃষ্টি হয়েছে বিরাট হতাশা এবং অজানা আশঙ্কা। এর থেকে মুক্তি দেয়ার দায়িত্ব সরকারের।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট।